মূলপাতা

ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক

Asif Adnan

January 18, 2022

20 MIN READ

[লেখাটি চিন্তাপরাধ বইটি থেকে নেয়া]

‘সাদা মানুষের বোঝা’

আজ থেকে চল্লিশ বছর পর কেবল মার্কিন দলিল-দস্তাবেজের ওপর ভরসা করে ইরাক যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরা নির্ঘাত অ্যামেরিকান মহানুভবতার তারিফ করবেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বর্বর এক জাতিকে সভ্য করে তোলা আর উন্মাদ স্বৈরাচারের ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের কবল থেকে পুরো পৃথিবীকে রক্ষা করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইরাকে যেতে হয়েছিল নিঃস্বার্থ অ্যামেরিকাকে, হয়তো এভাবেই উপসংহার টানবেন তারা। মার্কিন শান্তিযুদ্ধের বয়ানের আড়ালে চাপা পড়ে যাবে ইরাকে চালানো পাইকারি গণহত্যা, তেলের অতৃপ্ত নেশা, সেনাবাহিনী আর ব্ল্যাকওয়াটারের গা শিউড়ে ওঠা কুকীর্তির ফিরিস্তি। ইতিহাসের ফুটনোটেও হয়তো জায়গা হবে না লাখ লাখ ইরাকীর মৃতদেহের।

ভবিষ্যতের এ ইতিহাসবিদদের মতো করেই গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপিয়ানরা বিরতিহীনভাবে তাদের অসাধারণ সভ্যতার অসাধারণত্বের কথা আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের চোখে মানবসভ্যতার ইতিহাস এক সরলরৈখিক অগ্রগতির গল্প, যার সুন্দর এবং মধুরসমাপ্তি হয়েছে ইউরোপিয়ান সাদা সভ্যতায়। অগুস্ত কঁন্টের মতো দার্শনিকদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সভ্যতার ধারাবাহিকতায় নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আদিম মানুষ পরিপূর্ণতা পেয়েছে আধুনিক ইউরোপে। ইউরোপ হলো সভ্যতার যৌক্তিক ক্রমধারায় অর্জিত চূড়ান্ত উৎকর্ষ।

সভ্যতা বিস্মৃত, চিন্তা অবরুদ্ধ, মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত–এমন এক অবস্থায় আঁধারের বুক চিরে উদয় হলো শুদ্ধির ফিরিঙ্গি সূর্য। সূর্যস্নানে শুচি হলো ধরা। এল চিন্তা, মুক্তি, স্বাধীনতার আলো; শুরু হলো নতুন সভ্যতার নতুন দিন। সেই সাথে সাদা মানুষের কাঁধে চাপল নতুন এক দায়িত্ব–দুনিয়ার সব বর্বরের কাছে গিয়ে গিয়ে নতুন এ আলোয় তাদের দীক্ষিত করা। তাদের চিন্তা করতে শেখানো, জাতে ওঠানো, আলোকিত মানুষ গড়া। গাঁটের পয়সা খরচ করে, গতরের ঘাম ঝরিয়ে, সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাদা মানুষের বোঝা বহন করে দূরদূরান্তে ছুটে গেল নিঃস্বার্থ ফিরিঙ্গি বেনিয়া। সেই থেকে আজও সে ফেরি করে ফিরছে শ্বেত, শুভ্র ও শুদ্ধ সভ্যতা। ঠিক ইরাকে শান্তি স্থাপনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাওয়া আজকের অ্যামেরিকার মতো।

উপনিবেশ স্থাপন করে বর্বর বিশ্বকে মুক্তি, যুক্তি আর স্বাধীনতা শিখিয়েছে সাদা মানুষ। বিনিময়ে নিজের জন্য নিয়েছে অল্প কিছু সম্পদ। যতোটুকুনা নিলেই না। এতে কারও তো কোনো ক্ষতি হয়নি। অসভ্য নেটিভরা সেই সম্পদ দিয়ে করতও বা কী? আর যতটুকুনিয়েছে তাতে কি মানবজাতিকে দেয়া ফিরিঙ্গির ঋণ আদৌ শোধ হয়? ফিরিঙ্গি সভ্যতা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে সভ্যতা, সুশাসন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কার, সংস্কৃতি, আরও কত কী! অল্প কিছু সম্পদ লুট আর ঔপনিবেশিক আমলের কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে একা পুরো বিশ্বকে আধুনিক যুগের আলোয় টেনে তুলেছে ইউরোপ।

এই হলো সাদা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মুখস্থ ইতিহাস, ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান।

ইউরোপ যেহেতু তিন থেকে চার শ বছর আগে ‘আলো’ চিনেছে, তাই অবশ্যই পুরো বিশ্ব তার আগে আঁধারে ডুবে ছিল। মানবীয় যুক্তিকে এনলাইটেনমেন্ট যেহেতু দেবতার আসনে বসিয়েছে, তাই নিশ্চয় এর আগে পুরো পৃথিবী আচ্ছন্ন ছিল মিথোলজি আর কুসংস্কারে। আর হ্যাঁ, অতীতেও ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস কিংবা রোম ছিল, আধুনিক ফিরিঙ্গি সভ্যতা সেই সব মহান সভ্যতারই ধারাবাহিকতা। সবার ভালোটার সংমিশ্রণে সবার চেয়ে ভালো।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মাঝে মানুষের আদর্শিক বিবর্তনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ খুঁজে পেয়ে ১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফুকোইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তির ঘোষণা ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক এ বয়ানের ফসল। ফুকোইয়ামা একা না, একই ধরনের ধারণা বিভিন্ন আঙ্গিকে খুঁজে পাওয়া যায়, কোজেভ থেকে হেগেল পর্যন্ত অনেকের মাঝেই। নৈতিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারণা পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে সভ্যতাগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসকে উপেক্ষা করে ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক এ চিন্তা। এ চিন্তা আমাদের শেখায় আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা হলো সর্বকালের সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর সভ্যতা। পিছিয়ে পড়া সমাজগুলোর উন্নতির উপায় হলো পশ্চিমা সভ্যতার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। একটা সমাজ যত উন্নত, আধুনিক, পরিপক্ক হবে, তত সে আরও বেশি করে পশ্চিমের মতো হবে। যখন সে পুরোপুরিভাবে আধুনিক পশ্চিমা সমাজের মতো হতে পারবে তখন সম্পূর্ণ হবে পশ্চাৎপদ সমাজের উন্নতির প্রক্রিয়া। ইতিহাসের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা সহজাতভাবে ফিরিঙ্গি বর্ণবাদ ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লালন করে। এই চিন্তা অবধারিতভাবে এক ও অভিন্ন করে ফেলে সভ্যতা, উন্নতি আর 'পশ্চিমাত্ব'-কে। আমাদের এ উপসংহারে পৌঁছে দেয় যে, পশ্চিমের উন্নতির চাবিকাঠি হলো তাদের এনলাইটেনমেন্ট এবং তাদের পশ্চিমাত্ব। আমাদের অনগ্রসরতার কারণ হলো আমাদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আমাদের অ-পশ্চিমাত্ব। এগুলোকে ঝেড়ে ফেলে পশ্চিমের অনুসরণ করাই হলো আধুনিক, সফল, ধনী ও সভ্য হবার উপায়। সভ্যতা, উন্নতি আর অগ্রগতির অর্থ হলো পশ্চিমের মতো হতে পারা। এ কথা সত্য সমাজের এবং ব্যক্তির, উভয়ের জন্য।

নতুন গল্প, পুরোনো গল্পের মতোই

নিউযিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় ৫০ জন মানুষ খুন করা এবং সে দৃশ্য লাইভ টেলিকাস্ট করা ব্রেন্টন ট্যার‍্যান্ট তার ম্যানিফেস্টোতে লিখেছিল,

> 'হারলে ইতিহাস তোমাকে উপস্থাপন করবে দানব হিসেবে... আগে জিততে হবে, ইতিহাস পরে লেখা যাবে। ইতিহাস হলো শক্তি আর ক্ষমতার গল্প। সহিংসতা হলো শক্তি আর সহিংসতাই হলো ইতিহাসের বাস্তবতা'।[1]

আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের তুলনায় নিজের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের ব্যাপারে ঢের ভালো ধারণা রাখে ট্যার‍্যান্ট। বেশ অনেকদিন ধরে ইতিহাসের ব্যাপারে সাফল্যের সাথে এ পলিসিই বাস্তবায়ন করে আসছে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা।

ইতিহাস রচিত হয় বিজয়ীদের হাতে। বিজয়ীর চোখেই বিজিত ইতিহাসকে পড়তে শিখে। বাধ্য হয়। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, হলিউড, এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর ম্যাস মিডিয়ার কল্যাণে আমার-আপনার মতো সারা বিশ্বের অ-ফিরিঙ্গিরাও নিজেদের চিন্তার গভীরে গেঁথে নেয় ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান। নিজের অজান্তেই, প্রায় অবচেতনভাবে আমরা ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিকতার জারজ সন্তানে পরিণত হই। নিজেদের 'বন্য', 'বর্বর' পূর্বপুরুষ আর তাদের সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে আমাদের মাঝে কাজ করে তীব্র হীনম্মন্যতা। নানানভাবে চাপা দিতে চাইলেও আমাদের কথা, চিন্তা, কাজে বারবার অপ্রতিরোধ্য স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে নিজেকে ছোট ভাবার, সাদা মানুষের জাতে ওঠার এ বোধ। যার কারণে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ কিংবা পোস্ট কলোনিয়াল কন্ডিশনের সমালোচনায় তুবড়ি ছোটানো লোকেরাও মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের পথ ও পন্থা নিয়ে প্রশ্ন করলে গণতন্ত্র, কল্যাণরাষ্ট্র কিংবা ইসলামী জ্ঞানের 'রেনেসাঁ' ছাড়া অন্য কোনো সমাধান দেখতে কিংবা দেখাতে পান না। আমাদের পশ্চিম বিরোধিতা, উত্তরণের স্বপ্ন, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম, কোনোটাই ফিরিঙ্গিদের তৈরি করে দেয়া বাক্সের বাইরে যায় না।

ঝাঁ চকচকে ঘড়ির কাঁটা মেনে চলা সেলোফিনে মোড়ানো পরিপাটি পশ্চিমা সভ্যতার সাথে নিজেদের দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি আর অস্থিরতায় ভরা দেশগুলোর তুলনা করতে গিয়ে আমরা একসময় ফিরিঙ্গিদের দাবি মেনে নিই। ধরে নিই পশ্চিমের আজকের সাফল্যের মূল রহস্য হলো তাদের আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু ইতিহাস; ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের রাজ্যগুলো ব্যস্ত ছিল নিজেদের মধ্যে একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। নিরন্তর যুদ্ধের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে তাদের গড়ে ওঠে সমীহ জাগানিয়া সামরিক শক্তি, অস্ত্র, রণকৌশল। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বারুদ এবং শক্তিশালী কামানের ব্যবহারে অগ্রগতি। নতুন এ প্রযুক্তির সুবাদে শুরু হওয়া সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে অস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলে বাকি পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যায় ইউরোপ। ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখন বুঝতে পারল তাদের ছোট্ট মহাদেশের বাইরে বিশাল এক অপ্রস্তুত পৃথিবী দখল হবার জন্য বসে আছে, তখন সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যেকার লড়াই বন্ধ করে মানচিত্রজুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল ঔপনিবেশিক লুটপাটে। সামরিক অগ্রগতি এবং নৈতিকতার বাঁধন থেকে মুক্ত হবার কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আগ্রাসী ফিরিঙ্গিরা দখল করে নিল পৃথিবীর প্রায় 85% এলাকা। সভ্যতা ফেরি করা সাদা মানুষের চালানো অভূতপূর্ব মাত্রার লুটপাটে উপনিবেশগুলো থেকে সব সম্পদ গিয়ে জমা হতে লাগল ইউরোপে। দিন দিন বাড়তে থাকল ফিরিঙ্গিদের সম্পদের পাহাড়, দরিদ্র হতে থাকল বাকি বিশ্ব।[2] উপনিবেশগুলোকে শুষে ছিবড়ে বানানোর পর যখন লুট করার মতো আর কিছু কিংবা কাউকে পাওয়া গেল না, তখন ফিরিঙ্গিরা আবারও মনোযোগ দিলো নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধে। দুই বিশ্বযুদ্ধের নামে পৃথিবীকে উপহার দিলো প্রায় ১০ কোটি মানুষের মৃত্যু।

মাত্র এক শ বছর আগেও যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সারা পৃথিবীর সম্পদ ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল, আজ কেন তারা ধনী এবং বাকি সবাই গরিব, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু না। মুসলিম বিশ্বসহ, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলোর সাথে ইউরো-অ্যামেরিকার যে সম্পদের বৈষম্য আজ আমরা দেখতে পাই সেটা সরাসরি এই ঔপনিবেশিক লুটপাটের ফসল।

একটা সহজ উদাহরণ দেখা যাক। ফিরিঙ্গিদের আগ্রাসনের আগে উপমহাদেশের জিডিপি ছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির ২৪.৪%। [3] সেটা ফিরিঙ্গিদের আসার আগের কথা। আর ১৯৫২ সালে ব্রিটেন বিদায় নেয়ার সময় ভারতীয় উপমহাদেশের জিডিপি ছিল পৃথিবীর মোট জিডিপির ৩.৮%।[4]

বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতির ৩.৮% এ পরিণত হবার মাঝের গ্যাপটা হলো অসভ্য বাদামি নেটিভদের জাতে তোলার জন্য সাদা মানুষের ফী। বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওপেন এয়ার টয়লেটে পরিণত হওয়া হলো ফিরিঙ্গির কাছ থেকে সভ্যতা শেখার দাম।

এ বাস্তবতাকে ঐতিহাসিক লেফটেন স্টাভরিয়ানোস ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে,

> ‘তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন আর প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন বিচ্ছিন্ন, আলাদা ঘটনা না। বরং এ দুটো কার্যত ও সহজাতভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই অনুন্নয়ন (তৃতীয় বিশ্বের) প্রাথমিক বা আদি অবস্থা না, পশ্চিমা জাতিগুলোর দেখানো শিল্পায়নের পথ অনুসরণ করে যা থেকে উঠে আসতে হবে। আজকে পশ্চিমা দেশগুলোর ঠিক সেই মাত্রায় উন্নত যেই মাত্রায় অন্য দেশগুলো অনুন্নত। উন্নতি ও অনুন্নতির এ অবস্থা হলো একই মুদ্রার দুই পিঠ... অনুন্নয়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাঠামোর কোনো অভ্যন্তরীণ ঘটনা না; বরং এ হলো বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ফসল।’[5]

নেটিভদের ব্যাপারে সভ্য সাদা মানুষদের মনোভাব কেমন ছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায় বিখ্যাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ‘লর্ড’ সিসিল রোডসের নিচের কথাগুলো থেকে :

> ‘আমি বলি, আমরা (অ্যাংলো-স্যাক্সন) পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জাতি। আমরা পৃথিবীতে যত বেশি ছড়িয়ে পড়ব সেটা মানবজাতির জন্য তত ভালো। পৃথিবীর যেসব জায়গায় এখনো মানুষ নামের জঘন্য সব জীব বসবাস করছে সেগুলোকে যদি অ্যাংলো-স্যাক্সন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তাহলে কী পরিমাণ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে চিন্তা করো!’[6]

> ‘আমি রোডেশিয়া দখল করতে চেয়েছিলাম কারণ আমি আসলেই বিশ্বাস করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হলে আফ্রিকা

> আরও বেশি ধনী, নিরাপদ ও সুখী হবে। মানুষ বলে সাম্রাজ্য গঠন হলো শুধু 'চুরি' এর 'লুটপাট'; কিন্তু রোডেশিয়াতে সবাই সুখে আছে, এমনকি যাদেরকে আমরা অধীনস্থ করেছি তারাও।'[7]

> 'নেটিভদের সাথে আচরণ করতে হবে শিশুর মতো এবং তাদের ভোটাধিকার দেয়া যাবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বরদের সাথে বোঝাপড়ায় আমাদের স্বৈরতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করতে হবে যেমনটা ইন্ডিয়াতে সফলতার সাথে করা হয়েছে।'[8]

সিসিল রোডসের মতো খোলাখুলি না বললেও বাকি বিশ্বের ব্যাপারে আজও পশ্চিমা শক্তিগুলো একই ধরনের বর্ণবাদী সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লালন করে। মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখনো তর্কচলে মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে। পশ্চিমা সরকার এবং মিডিয়াগুলো নিয়মিত নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের প্রশ্নে সবক দেয় আমাদের। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কীভাবে আরও বেশি করে পশ্চিমের মতো হয়ে আধুনিক হতে পারবে তা নিয়ে অ্যাকাডেমিক চালে চলে ফিরিঙ্গি গবেষকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং অবশ্যই এ সবকিছু হয় পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত এবং 'কিছুটা বর্বর' মুসলিম এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অধিবাসীদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে! হতভাগ্য এসব মানুষকে অন্ধকার থেকে পশ্চিমা সভ্যতা, গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতার চোখ ধাঁধানো আলোয় টেনেহিঁচড়ে বের করে আনার উদ্দেশ্যে । আজকের বুশ, ওবামা, ট্রাম্প এর ট্রুডোরা এখনো সিসিল রোডসের মতোই সাদা মানুষের ভারী বোঝাটা বয়ে চলে।

বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ে বড় বড় সংখ্যায় মানুষ খুন করার অভ্যাসটা পশ্চিমের নতুন না। যেমন কঙ্গোর অধিবাসীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী বেলজিয়ামের অকথ্য অত্যাচার আর গণহত্যার শুরুটা হয়েছিল 'নেটিভদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' এর নামে। রাবার চাষে বাধ্য করার জন্য চাষিদের স্ত্রী-সন্তানদের জিম্মি করা, নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য হাত কেটে ফেলা, টর্চার, ধর্ষণ আর পাইকারি হত্যা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐতিহাসিক অ্যাডাম হোকশিল্ডের মতে বেলজিয়ানদের 'জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্পের বলি হয়ে জীবন দিতে হয় কঙ্গোর প্রায় ১ কোটি অধিবাসীর।[9]

শুধু তাই না, সাদা মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্রাসেলসের মানব চিড়িয়াখানায় অ-সাদা মানুষদের পশুর মতো উপস্থাপন করা হতো প্রদর্শনীর জন্য । কেবল ব্রাসেলসেই না; প্যারিস, লন্ডন, হামবর্গ, মিলান, বার্সেলোনা, অ্যান্টওয়েরপ–সমস্ত ইউরোপজুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল হিউম্যান যু বা মানব চিড়িয়াখানা। ইউরোপের এই সভ্য সংস্কৃতি পরে পৌঁছে গিয়েছিল সমুদ্রের ওপারে নিউইয়র্কেও। তুয়ারেগ বেদুঈন, মিসরীয় নুবিয়ান, আদিবাসী অ্যামেরিকান, এস্কিমো, সুরিনামের অধিবাসী, ভারতীয় উপমহাদেশের সিংহলী আদিবাসী, ফিলিপিন্সের অ্যাপাচি ও ইগরট, আর আফ্রিকার নানা জাতের 'নিগার'–সভ্য ফিরিঙ্গিদের সাময়িক আনন্দের জন্য এভাবে পশুর মতো খাঁচায় প্রদর্শিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে সবারই।[10]

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তখনকার মতো এখনো ফিরিঙ্গিরা বিশ্বাস করে যে তারা আসলে বাকি পৃথিবীর উপকার করেছে। পার্থক্য হলো আজকের ফিরিঙ্গিরা হয়তো এটুকুস্বীকার করবে যে ঔপনিবেশিক আমলে তাদের বেশ কিছু ভুলত্রুটি হয়েছিল। অল্প কিছু লোক হয়তো মানবতাবিরোধী অপরাধ হবার কথাও স্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করবে। কিন্তু এরাই আবার সাফাই গাইবে গণতন্ত্র, শান্তি ও উদারনৈতিকতার নামে আজকের পৃথিবীতে চালানো ফিরিঙ্গি লুটপাট ও ধ্বংসের। এমন সব যুক্তি দেবে যেগুলো সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক যুক্তির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না। ঘটা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়া হবে ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে নিহত প্রতিটি মার্কিন সেনার নাম, রুপালি পর্দায় তাদের মহিমান্বিত করা হবে র‍্যাম্বো, ক্যাপ্টেন অ্যামেরিকা, অ্যামেরিকান স্নাইপার কিংবা জিআইজো হিসেবে। কিন্তু কোটি কোটি মুসলিমের জীবন তছনছ করে দেয়া অ্যামেরিকান আগ্রাসন, খুন, ধ্বংস আর ধর্ষণের কথা বলার সময় হবে না বিশ্ব মিডিয়ার। সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের মাত্রা নিয়ে অল্পস্বল্প আলোচনার করার সুযোগ হবে না 'ইসলামী চরমপন্থা' নিয়ে বছরের পর গবেষণা করা বিশ্লেষক, অ্যাকাডেমিক আর বুদ্ধিজীবীদের। সবকিছুর পরও পশ্চিমা বিশ্ব ঠিকই আগ্রাসী অ্যামেরিকাকে হিরো আর প্রতিরোধকারীকে জঙ্গি বলে যাবে। আওড়ে যাবে ফিরিঙ্গি আগ্রাসনকে শান্তি আর আগ্রাসনের প্রতিরোধকে সন্ত্রাস বানানোর মন্ত্র। আর আমরাও দিনের পর দিন এ বুলি শুনব, মানব, বিশ্বাস করব; আর তারপর অবিকল পুনরাবৃত্তি করে যাব।

এ সবকিছুর পেছনে কাজ করে সিসিল রোডসের কথায় সোজাসাপ্টা উঠে আসা ওই সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। তফাত হলো আগে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে ওরা আমাদের হত্যা করত; এখন হত্যা করে দর্শন, রাজনীতি আর মানবাধিকারের কথা বলে। বেলজিয়াম থেকে আসা ফিরিঙ্গির কাছে কঙ্গোর মানুষেরা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শিখতে চায় কি না সেটা কাল মুখ্য ছিল না। অ্যামেরিকা আর ইউরোপের ফেরি করা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার টোটকা ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেন কিংবা সোমালিয়ার মুসলিমরা চায় কি না সেটাও আজ গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হলো মহানুভব ফিরিঙ্গি এটুকুনিজ ইচ্ছায় আমাদের দিতে চেয়েছে। এতেই আমাদের ধন্য হতে হবে।

এ নতুন গল্প সেই পুরোনো গল্পের মতোই।

আদর্শিক উপনিবেশ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর প্রায় ৮৫% ছিল ইউরোপের দখলে।[1] কিন্তু কেবল এ তথ্যটা থেকে ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদের মাত্রা পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব না। দখলদারের ক্ষমতা আর শক্তি কেবল অস্ত্র আর সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে না; বরং অনেক সময় দখলদারির আরও অনেক বেশি শক্তিশালী উপকরণে পরিণত হয় আদর্শ ও দর্শন। এ বাস্তবতাটুকু বুঝতে অনেক সময় ভুল করে ফেলি আমরা। দুই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর উপনিবেশগুলোর ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ। শেষ হয় শারীরিক দাসত্বের পালা। কিন্তু চিন্তাচেতনার ওপর ফিরিঙ্গিদের আদর্শিক উপনিবেশ টিকে যায়।

ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান মাথার ভেতরে নিয়ে বড় হওয়া মুসলিম স্বাভাবিকভাবেই কোনো না কোনোভাবে বিশ্বাসের এক সংকটে পড়ে। নিজের চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখে দুর্নীতি, অনিয়ম, অভাব, অন্যায়। অন্যদিকে পশ্চিমের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সম্পদ, সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ। পশ্চিমা সভ্যতার শত সহস্র কোটি নিয়ন বাতির আলোতে তার চোখ ঝলসে যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে এ উপসংহারে আসতে হয় যে, আমাদের পিছিয়ে পড়া বর্তমানের জন্য কোনো না কোনোভাবে দায়ী আমাদের ধর্ম। হয় সে ইসলামকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করে, অথবা বলে ইসলামকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার কথা। মোটকথা সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর জীবন থেকে পাওয়া ইসলামের আদি, অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ বুঝকে সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়–সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে।

যারা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা তো বেশ ভালো আছে। শান্তি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সম্পদ, প্রাচুর্য, অধিকার–কী নেই পশ্চিমে? অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর কী অবস্থা? আমরা পিছিয়ে পড়া, গরিব, আইন নেই, বিচার নেই, অধিকার নেই, এমনকি ভালো সভ্য আচরণের মানুষও নেই। তাহলে ইসলাম মুসলিমদের কী দিলো আর কুফর পশ্চিমকে কী দিলো?

দিনরাত ২৪ ঘণ্টা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, টিভি, সিনেমা, মিডিয়া–সব জায়গা থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমাদের তরুণদের এই মেসেজ দেয়া হয়। তাদের সামনে তুলে ধরা হয় ফিরিঙ্গি সভ্যতার কসমেটিক সার্জারি করা চেহারা, চেপে যাওয়া হয় সাদা সভ্যতার পেছনের কালো অধ্যায়। এ বিষাক্ত বার্তা একবার মাথায় ঢুকে যাবার পর ইসলামের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া কিংবা একেবারে ইসলাম ত্যাগ করা খুব অস্বাভাবিক কিছু না। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যেমন ফিরিঙ্গির মাথায় সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা গেঁথেছে, তেমনি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে পরাজিত মানসিকতা আর সহজাত হীনম্মন্যতা। পুরো দুনিয়াতে আগুন লাগিয়ে দেয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীজুড়ে শোষণ, লুটপাট, রাহাজানি, ধর্ষণের মহাকাব্য রচনা করা ফিরিঙ্গিদের ইতিহাস আমাদের ভাবায় না। গত এক শ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর চালিয়ে যাওয়া একের পর গণহত্যার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। যে সংস্থা আমাদের মাটি চুরি করে সেখানে সন্ত্রাসী ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা তৈরি করে, সেই জাতিসংঘের কাছেই আমরা দেনদরবার করি বিচারের জন্য। আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, ইসলামী শরীয়াহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার যে গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার মাঝেই আমরা ইসলামের উত্তরণের পথ খুঁজি। ঈমান ও কুফরের সংঘাতের প্রশ্ন আমাদের চিন্তিত করে না। ইসলামের সাথে পশ্চিমা তন্ত্রমন্ত্রের সাংঘর্ষিকতা নিয়ে ভাবার সময়টুকুও আমাদের হয় না। যেকোনো মূল্যে আমরা শুধু ওদের মতো হতে চাই। জাতে উঠতে চাই। চন্দ্রাহতের মতো ঘোরলাগা চোখে আমরা জীবনভর ছুটে চলি

ফিরিঙ্গিদের হলুদ, বাদামি কিংবা কালো প্রতিরূপ হবার চেষ্টায়। মুক্তি, উন্নতি, সাফল্যের পথ হিসেবে পশ্চিমের শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে শুষে নেয়া আমরা অবধারিতভাবেই ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসকে স্থান দিই পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনের নিচে। আর এভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ক্ষতি ইউরোপ পুষিয়ে নেয় মানসিক দাসত্বের মাধ্যমে।

তাই বর্তমানে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এটা,

১৪০০ বছর আগেকার ইসলামের সেই বার্তা কি আজও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ? এ শিক্ষা কি আজও বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে? ঘুরিয়ে দিতে পারে ইতিহাসের মোড়?

এ প্রশ্নের জবাবে ফিরিঙ্গি সভ্যতার উত্তর স্পষ্ট। তাদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে সহনশীল ও সচেতন লোকও বলবে, ইসলাম ওই সময়ের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আজ সেই ইসলাম সেকেলে, তামাদি হয়ে গেছে। এখন আর সেই আদর্শকে আঁকড়ে থাকা যাবে না। যদি ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখতেই হয়, তাহলে ইসলামের মধ্যে একটা সংস্কার আনতে হবে– আধুনিকতার সাথে তাল মেলানোর জন্য যেমনটা খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা করেছে। একই ধরনের কথা বলে উম্মাহর নব্য মুরজিয়া আর মু'তাযিলারাও–'আধুনিক সময়ের জন্য আমাদের আধুনিকভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ইসলামী বিধিবিধানগুলো আমাদের সংস্কার করতে হবে অথবা বদলাতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের শিক্ষাগুলো এরই মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতায় যুক্ত করা হয়ে গেছে। কল্যাণরাষ্ট্র, মানবতার মুক্তি, সামাজিক আন্দোলন, গণতন্ত্র এসবের মধ্যেই ইসলামের শিক্ষা মিশে আছে। তার ওপর পশ্চিমারা এসব ধারণাকে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে আমরা তলিয়ে গেছি অজ্ঞতার অন্ধকারে। তাই আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।' জাতে উঠতে ইচ্ছুক কোনো বুদ্ধিজীবী হয়তো আরও গালভরা শব্দে বলবে শরীয়াহর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের কথা।

কিছু দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া আজ বিভিন্ন মাত্রায় ওপরের কথাগুলো আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। উম্মাহ আজ বিশ্বাস করে আমাদের উত্তরণের পথ হলো পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, চিন্তা ইত্যাদির সাধনা। বুঝে কিংবা না বুঝে আজ অধিকাংশই মনে করে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফ আস সালেহিনের বুঝ আজ আমাদের জন্য যথেষ্ট না। সম্পূরক হিসেবে সাথে যুক্ত করতে হবে পশ্চিমা ব্যবস্থা, দর্শন, চিন্তা। এই মানসিক দাসত্ব এবং ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো উম্মাহর উত্তরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

বিংশ শতাব্দীকে এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্টের রিপোর্ট কার্ডহিসেবে দেখা যায়। রেসাল্ট খুব একটা ভালো না। সহিংসতা, খুন, ধ্বংস, জাতিগত নিধন, টর্চার, মানুষ মারার নতুন নতুন প্রযুক্তি, অভূতপূর্ব মাত্রায় গণহত্যা, সমাজ ও নৈতিকতার অধঃপতন– প্রতিটি দিক দিয়ে ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়কে হয় মাত্রা নয় তীব্রতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে আলোকিত ফিরিঙ্গি সভ্যতা। সেই সাথে পশ্চিমা দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষকদের মতেই নৈতিক এবং আদর্শিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা পৌঁছে গেছে খাদের কিনারায়। অথচ আজও ফিরিঙ্গিদের মানসিক গোলামি করে করে আমরা পশ্চিমের অনুকরণ করে যাচ্ছি এবং একে মনে করছি উন্নতির একমাত্র পথ। আজও ফিরিঙ্গিদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাদের দর্শন তৈরি করছে 'নেটিভ'-দের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া আর সাদা প্রভুদের তৈরি করা ছাঁচে গড়ে ওঠা শত সহস্র অনুগত, আজ্ঞাবহ কেরানি।

ফিরিঙ্গি আগ্রাসন আমাদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে তা হলো এই মানসিক দাসত্ব। সম্পদ, কাঠামো, ইত্যাদির ক্ষতি সাময়িক; কিন্তু মানসিক দাসত্ব দীর্ঘমেয়াদি। ফিরিঙ্গিরা যেখানেই গেছে চেষ্টা করেছে বিজিতদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের চেতনায় পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে গেঁথে দিতে। সেনা মোতায়েন না করে, শেকলে না বেঁধেও আজও পশ্চিমারা আমাদের দূরনিয়ন্ত্রিত পাপেটের মতো চালাতে পারছে কারণ সব দখলদারির সাফল্য দিন শেষে নির্ভর করে বিজিত জাতির জ্ঞান, আদর্শ ও আকিদাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ওপর। সাদা মানুষদের পরানো কালো শিকলগুলো শরীর থেকে খুলে এলেও চিন্তার শেকলগুলো এখনো খুলতে পারিনি আমরা। অদৃশ্য এ উপনিবেশের জন্যই হাজার হাজার মাইল দূরে বসে চাবি দেয়া পুতুলের মতো পশ্চিমা লেন্সে পৃথিবীকে দেখতে শেখা এই আমাদের আজও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ফিরিঙ্গিরা।

মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার প্রথম ধাপ হলো আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আবদ্ধ করে রাখা এ অদৃশ্য শেকলগুলোকে চেনা। একই সাথে এ সত্যকে বোঝা যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব সীমিত একটা টাইমফ্রেইমের মধ্যে কাজ করে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত করে দেয় আমাদের চিন্তাকেও। দুই-তিন শ বছরের সভ্যতাকে আমাদের কাছে মনে হয় চিরন্তন, অপ্রতিরোধ্য। অ্যামেরিকা, ন্যাটো কিংবা ইস্রায়েলের সামরিক শক্তিকে আমাদের কাছে অজেয় মনে হয়। কিন্তু এর কোনো কিছুই চিরন্তন না, অজেয় না। নমরুদ, ফিরআউন, আদ, সামূদের অতিকায় সভ্যতাও একসময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে–নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। দিগ্বিজয়ী অ্যালেক্স্যান্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পর মাত্র একটি শতাব্দীও টিকে থাকেনি। মধ্য আর উত্তর এশিয়ার বিস্তীর্ণ স্তেপ ভূমি থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসা একদা অপ্রতিরোধ্য মঙ্গোল বাহিনী হালাকুখানের মৃত্যুর এক শ বছরের মধ্যে নিজ পূর্বপুরুষদের হাজার বছরের প্রকৃতিপূজার ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। পারস্য সম্রাট হরমুযান যাদেরকে মরুভূমিতে ছুটোছুটি করা লক্ষ্যহীন কুকুরের পাল বলে তাচ্ছিল্য করেছিল, সেই আরবরাই হাজার বছরের পার্সিয়ান সাম্রাজ্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করেছেন মাত্র কয়েক বছরে। কোনো ছিটেফোঁটা ছাড়া দুনিয়ার বুক থেকে বেমালুম মিলিয়ে গেছে নিযুত সদস্য বিশিষ্ট নাৎসি ওয়্যারম্যাখট (প্রতিরক্ষা বাহিনী)। কিন্তু তাওহিদের শিক্ষা, ইসলাম আজও টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। অ্যামেরিকার বিমান যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন সব সময় থাকবে আর-রাহমানের আরশের নিচেই। অপ্রতিরোধ্য, চিরন্তন, অজেয়, অমুখাপেক্ষী হলেন এক আল্লাহ, বাকি সবাই ধ্বংস হবে। মুসলিম হিসেবে আমাদের কাজ হলো সেই রাজাধিরাজ, সেই আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁরই দেখানো পথে তাঁরই সন্তুষ্টির অর্জনের চেষ্টা করা।

আজও কুরআনের শিক্ষা সেই একই ক্ষমতা ধারণ করে–যা মরুভূমিতে নিজেদের মধ্যে অন্তহীন, অর্থহীন যুদ্ধে ব্যস্ত একদল বেদুইনকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল পৃথিবীর। জন্ম দিয়েছিল এক হাজার বছরের এক গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার। কিন্তু সেই কুরআনের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবার বদলে আমরা এখনো মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছি ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক মুগ্ধতায়, গোঁ ধরে অনুসরণ করে যাচ্ছি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের, তাদের গিরগিটির গর্তের গভীর থেকে আরও গভীরে।[2]

* * *

[1] *Why Did Europe Conquer the World?*, Philip T. Hoffman (2015)

[2] ড. আসাদ যামানের 'European Transition To Secular Thought', এবং 'The Conquest Of Knowledge' অবলম্বনে।

* * *

[1] The Great Replacement, 2019, Brenton Tarrant

[2] *Why Did Europe Conquer the World?*, Philip T. Hoffman (2015)

[3] *The Cambridge Economic History of India*: Volume 2, c.1751-c.1970 (1983), Contours Of The World Economy, 1-2030 AD (2007), Angus Maddison

[4] "Of Oxford, economics, empire, and freedom", Manmohan Singh, The Hindu. Chennai. 2 October 2005

[5] *Global Rift: The Third World Comes of Age*, Chapter 1, L. S. Stavrianos (1981)

[6] Rhodes, Cecil (1902). Stead, William Thomas, ed. The Last Will and Testament of Cecil John Rhodes, with Elucidatory Notes, to which are Added Some Chapters Describing the Political and Religious Ideas of the Testator, p 58.

[7] Cecil Rhodes, The Founder: Cecil Rhodes and the Pursuit of Power

[8] Magubane, Bernard M. (1996). *The Making of a Racist State: British Imperialism and the Union of South Africa, 1875–1910*. Trenton, New Jersey: Africa World Press. ISBN 978-0865432413.

[9] *King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa* (1998), Adam Hochschild

[10] From human zoos to colonial apotheoses: the era of exhibiting the Other by Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, and Sandrine Lemaire

Moving bodies, displaying nations : national cultures, race and gender in world expositions : Nineteenth to Twenty-first century (2014) Guido Abbattista

Human zoos: When real people were exhibits, BBC, December 27, 2011